সম্পাদকীয়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

এক

...একটি উপন্যাসের বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাবছি। একজন গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ যার সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সে ব্যবসা হিসেবে বেছে নিল কবর পূজা। এ লোকটি কিরকম আচরণ করে তা আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন লোক হঠাৎ উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপর চুনকাম করে তার ওপর লালসালু বিছিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল। সরল বিশ্বাসী পথচারীরা চিরন্তন বিশ্বাসের ভারে এতই অভিভূত যে তারা নানাবিধ কামনায় সেখানে টাকা পয়সা দিতে লাগল। আমাদের দেশে এরকম দারগা কিন্তু অনেক গড়ে উঠেছে। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না জানি, তবুও এ ব্যবসা ক্রমান্বয়ে প্রসারের পথে। এরকম একজন ব্যবসায়ীর চাতুর্যকে আমি আবিস্কার করতে চাই, মিথ্যাচারকে আবিষ্কার করতে চাই, আবার মমতার মধ্যেও তাকে পেতে চাই। এটা কি করে সম্ভব হবে আমি জানি না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রথম উপন্যাস লালসালু-র ভাবনাবীজ এইভাবে তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য একথা জানা যায় না অশনি সংকেত উপন্যাসের গঙ্গাচরণ তাঁর মজিদ চরিত্র নির্মাণে কোনো সংযোগ তৈরি করে ছিল কি না - মহব্বতনগরের একমাত্র গ্রামীণ পির হয়ে উঠতে চাওয়া মজিদের মতো গঙ্গাচরণও তো একটা গ্রাম খুঁজেছিল যেখানে আর কোনো ব্রাহ্মণ নেই।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বেঁচে থাকতেই লালসালু উপন্যাসের করাচি থেকে উর্দু তরজমা, প্যারিস থেকে ফরাসি অনুবাদ, লন্ডন থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং জার্মান থেকে জার্মানি অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছিল। লালসালু-র এই সব ইংরেজি, জার্মানি ও ফরাসি অনুবাদ পশ্চিম ইয়োরোপে তাঁর লেখক প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।* ১৯৬১ সালে তিনি লালসালু উপন্যাসের জন্য শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার'-এ সম্মানিত হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যা শুরু হল তাঁর লালসালু উপন্যাসের চিত্রনাট্য দিয়ে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মননশীল চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল লালসালু-র চিত্রনাট্য নির্মাণ ও পরিচালনা করেছেন। এই চিত্রনাট্যটি মুদ্রণের ক্ষেত্রে তাঁর সাড়া ও সহযোগিতা আমাদের বিমুগ্ধ করেছে। এবং এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের প্রাথমিক সেতু তৈরির জন্য আমরা অবশ্যই বিশিষ্ট সাহিত্য অনুরাগী সুশীল সাহার কাছে কৃতজ্ঞ।

ঊনত্রিশটি সিকোয়েন্স ও অগণন দৃশ্য দিয়ে নির্মিত লালসালু-র চিত্রনাট্যটি প্রায় উপন্যাসকে সামনে রেখে হুবহু নির্মিত। কয়েকটি দৃশ্য পরিচালক স্বাধীনভাবে নির্মাণ করেছেন - যা উপন্যাসটিরর ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভিন্ন চলচ্চিত্র - মাত্রা যোজিত করেছে।

ঢাকা থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত লালসালু উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্-র বিশেষ বন্ধু শিল্পী জয়নুল আবেদীন। ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে লালসালু-র উংরেজি অনুবাদ Tree Without Roots প্রকাশিত হয় লন্ডনের চ্যাটু অ্যান্ড উইন্ডস থেকে। এই অনুবাদ - গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। এ সংখ্যার ছবি শুরু হল তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ - চিত্র দিয়ে। উলটো পৃষ্ঠায় ছাপা হল লালসালু-র প্রথম পাণ্ডুলিপির একটা পৃষ্ঠা। এরপর ছাপা হল লালসালু চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র। এবং একেবারে শেষে ক্যামেরা সহ পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের স্থিরচিত্র।

---

*লালসালু উপন্যাস - আলোচনায় ইংল্যান্ডের Sunday Telegraph লেখককে 'gifted novelist' বলে সম্মানিত করেছিল। বিখ্যাত সাময়িকী 'Poetic and hunting novel...movel that has the timeless quality.' মন্তব্য করে :

দুই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র আত্মপ্রকাশ পত্রিকায় 'নয়নচারা' গল্প লিখে। * তাঁর প্রথম গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ নয়নচারা প্রকাশ পায় 'পূর্ব্বাশা প্রকাশনী' থেকে ১৯৪৪ সালে (চৈত্র ১৩৫১)। তাঁর মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ - নয়নচারা (১৯৪৪) এবং দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)। তাঁর গ্রন্থবদ্ধ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রন্থবদ্ধ গল্প নিয়ে সর্বমোট পঞ্চাশটির মতো গল্প। এ সংখ্যায় তাঁর গল্প নিয়ে চারটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হল। এর মধ্যে প্রথম মুদ্রিত আবদুল মান্নান সৈয়দের দীর্ঘ প্রবন্ধটি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র অবস্থান ও অবদান চিনিয়ে দেয় সঠিক মূল্যায়নে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের মূল্যায়নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা কবিতাসাহিত্যের দুটি ধারা আলোচিত : একটি, আবহমান বাংলা ছোটোগল্পের ধারা; আর একটি, বাঙালি - মুসলমান - বাহিত ছোটগল্পের ধারা।

রবীন্দ্রনাথের হাতে উনিশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে প্রকৃত ছোটোগল্পের সূচনার বছর চল্লিশ অতিক্রান্তির পর ওয়ালীউল্লাহ্-র গল্পকার-উত্থান। তাঁর সাহিত্যের দুটি দিক : এক, তাঁর গল্প - উপন্যাসে একেবারে সাধারণ মানুষ জায়গা করে নিয়েছে, অ-নায়ক হয়ে উঠেছে গল্প - উপন্যাসে প্রধান ; আর দুই, বর্হিজীবনের পালা অনেকখানি চুকিয়ে গল্প - উপন্যাস হয়ে উঠেছে অন্তর্মুখী। অর্থাৎ একই সঙ্গে সমাজচেতনা ও অন্তশ্চেতনা। নয়নচারা গল্পগ্রন্থের আটটি গল্পে নায়কই উঠে এসেছে নিম্নবর্গ জীবন থেকে - ভিখিরি, চোর, সারেং, মাঝি, দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন ইত্যাদি। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো, কল্লোলের দুই জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ - জগদীশ গুপ্ত (১৯৮৬ - ১৯৫৭) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ - ৫৬) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রকৃত পূর্বসূরি।

অন্যদিকে বাঙালি - মুসলমান গদ্য-লেখকদের গল্প লেখার ধারা প্রায় অস্পষ্ট। সৈয়দ এমদাদ আলী, বেগম রোকেয়া, কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি নজরুল ইসলাম গদ্য লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের গদ্য - চর্চা বড়োজোর কল্লোলীয়দের সমানধর্ম। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রকৃত গল্প -শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর এই সাফল্যের বাহ্যিক কারণ: একদিকে পেশাজনিত আভিজাতিক - আন্তর্জাতিক মানস - সংযোগ, অন্যদিকে নবোত্থিত মুসলিম কলকাতায় অবস্থান, পূর্ব্বাশা - চতুরঙ্গ - সাওগাত - মোহাম্মদী-র সংযোগ, দেশি -বিদেশি সাহিত্যের পাঠ ও অনুশীলন ওয়ালীউল্লাহ্-র সৃজনশীল মানসকে 'দেশজ' ও 'দেশোত্তর' লক্ষণসমূহে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

যে-কোনো মৌলিক এবং কালোত্তীর্ণ লেখকের মতো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রথম গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তিনি কোন ধারার লেখক বা সাহিত্যে তিনি কোন নতুন ধারা উন্মোচন করতে চলেছেন। 'নয়নচারা' গল্পেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল তিনি সমাজ - সজ্ঞান মনোবাস্তবতার লেখক হয়ে উঠবেন ক্রমশ। এবং তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত উপমা রূপক আমাদের ক্রমশ আধুনিক কবিতার কাছাকাছি নিয়ে যাবে, মনে করিয়ে দেবে আধুনিক চিত্রশিল্পের কথা। ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রথম গল্পগ্রন্থ নয়নচারা-র প্রথম গল্প 'নয়নচারা'তেই এই সমস্ত আধুনিকতার কুললক্ষণ সুস্পষ্ট। যেমন : 'নয়নচারা' গল্পে অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা স্পাইরাল নকশায় বিবৃত। বহির্বাস্তবে আসে ১৩৫০ -এর ভয়াবহ মন্বন্তর, অন্তর্বাস্তবে আছে স্নিগ্ধ পল্লবঘন ময়ূরাক্ষী নদী-তীরবর্তী নয়নচারা গ্রাম। পেটে অসীম খিদে নিয়ে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে কলকাতা শহরের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে আমু ও কয়েকজন আমুর শহরের মানসতা আবিষ্কারের গল্প 'নয়নচারা'। এ গল্প বলার গল্প নয়, পড়ার গল্প - বার বার পড়তে পড়তে নিরন্তন নিজের ও শহরের মানস আবিষ্কারের গল্প। যেমন, এ গল্প না পড়লে জানতে পারবেন না : গ্রামে মানুষের চোখে বৈরিতা নেই, বৈরিতা কুকুরের চোখে। আবার শহরে কুকুরের চোখে বৈরতা নেই, বৈরিতা মানুষের চোখে। তাহলে কি শহরের মানুষ 'ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়'। এই সব প্রশ্ন আপনাকে ভাবাতে, ভাবাতে থাকবে। আরও ভাবতে থাকবেন যখন আমুর মনোবাস্তবতার না - ভাষায় উচ্চারিত হবে, 'ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই'। 'পরিচয়' অভিধা বিষয়ে তবু নতুন জিজ্ঞাসা তৈরি হতে থাকবে আপনার মধ্যে। তবে শহর কি একেবারেই নির্দয়? না। 'তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ' শুনতে শুনতে তারও প্রাণ কাঁপে। 'অবশেষে দরজার প্রাণ' কাঁপল, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে - আস্তে অতি শান্ত গলায় বলল : 'নাও'। তারপর ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা আঁচলের প্রান্ত মেলে আমু ভাত নিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে থাকে, কেমন চেনা চেনা লাগে তার। প্রশ্ন করে : 'নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?' এ তো জিজ্ঞাসা নয় - গহনা উত্তর। এই উত্তর সমগ্র প্রকৃতি অন্বিত গ্রাম - মানসের - ওয়ালীউল্লাহ্ তুলির এক টানে এঁকে দিলেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র এক-একটি গল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্পাদকীয়তে সম্ভব নয়। অথচ বলার কথা থেকেই যায়। যেমন : 'পরাজয়' গল্পে নিসর্গ কথকতার মোটিভের সঙ্গে বিধৃত। এই গল্পে কুলসুমের চোখ যেন পরিবেশ ও নিসর্গের ছায়া ফেলে ফেলে বার বার বদলে বদলে যায়। কেবল এ গল্পে নয়, ওয়ালীউল্লাহ্-র সামগ্রিক কথাসাহিত্য মানুষ - মানুষীর 'আত্মার জানালা' চোখে - কীভাবে প্রতিবেশ - প্রকৃতির ছায়া প্রতিভাসিত হয় এই নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। এবং সে প্রবন্ধ অবশ্যই কোনো চিত্রশিল্পীকে বা চিত্রশিল্প - সমালোচককে লিখতে হবে।*

'দুই তীর' গল্পটি নানা কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ গল্প। এই গল্পটি যে খানদানি উচ্চবৃত্তের আশরাফ শ্রেণির মানুষদের আত্মিক সংকট নিয়ে লেখা - ওয়ালীউল্লাহ্ তেমন পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন।** অথচ নিজের পারিবারিক বৃত্তের নারী প্রতিনিধি হাসিনা সম্পর্কে তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন : 'এমনই তার মানসিক গঠন যে তার পক্ষে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। যে-পরিবারে সে মানুষ হয়েছে সে-পরিবারে কেউ কাউকে ভালোবাসা শেখায় না...।' এই গল্পের 'দারিদ্রজর্জরিত অতি সাধারণ' আফসারউদ্দিন তো আসলে মুসলমান সমাজের নিম্ন শ্রেণির, এদেশের নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত আতরাফ শ্রেণির প্রতিনিধি। আর দীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী হয়েও শক্ত শীতল উদাসীন হাসিনী তো আসলে মধ্যপ্রাচ্য বা ভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসলমান সমাজের আশরাফ শ্রেণির প্রতিনিধি। এই গল্পটি তাই শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য পরিসর ছাড়িয়ে আশরাফ - আতরাফের, উচ্চবর্গ - নিম্নবর্গের দ্বন্দ্বের অনেক বড়ো সামাজিক আকাশে পাড়ি দেয় - যেখানে আতরাফদের 'হাত নক্ষত্রের মত ছিটকে পড়ে' ও অধীরভাবে আশরাফদের 'হাতের সন্ধান করে'।

'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পে তুলসী গাছের প্রতীকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে নানা জিজ্ঞাসা উসকে দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন : শান্তি - কল্যাণময় গৃহে একদা যে সম্প্রীতি ছিল, অস্থির পরিস্থিতিতে তা তুলসীগাছের মতো ম্রিয়মান, বিবর্ণ হয়ে গেছে -এখন সম্মিলিত জল সিঞ্চনেই তা সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। অথচ বাস্তব অন্য রকম! সেখানে উলঙ্গ বাল্‌ব - এর আলোয় মোদাব্বেরের সযত্নে মেয়োয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে; মৌলবি ধরনের মানুষ এনায়েত চুপ থাকে - বুঝতে পারে না কী করণীয় তার; বামপন্থী মকসুদের বিশ্বাসের কাঁটা সংশয়ে দুলে - দুলে ডানদিকে হেলে থেকে যায়; অথচ, শান্তি - কল্যাণ - স্থিতি-র আশ্রয়দাত্রী গৃহকর্ত্রী গৃহহারা, তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিগন্তের ওপারে - 'তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই।'

'চিরায়ত প্রকাশন' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র গল্প সমগ্র-এর সম্পাদকের ভূমিকায় এ বাংলার বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ লিখেছেন, 'বিষয় নয়, তাঁর নির্মাণকলার জন্যই ওয়ালীউল্লাহ্ এক বিস্ময়কর ও স্বতন্ত্র গল্পকার হয়ে ওঠেন।' অথচ তাঁর প্রতিটি গল্প নির্মাণকলা ও বিষয় - ভাবনায় একেবারেই মৌলিক। 'বিষয় নয়' তাই তাঁর সম্পর্কে বলা যায় না। বরং বলা উচিত - বিষয় ও নির্মাণকলায় তিনি এক বিস্ময়কর কথাশিল্পী। যেমন এ সংখ্যায় পাঠিকার পাঠকে 'মেয়েলি পাঠ' রূপে চিহ্নিত করে তাঁর গল্প নিয়ে একটি অপূর্ব প্রবন্ধ লিখেছেন সুতপা ভট্টাচার্য। এরই পাশাপাশি অধিকাংশ আলোচনায় তাঁর শিল্প - সংযম এবং মাত্রা জ্ঞানের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে। আবদুল মান্নান সৈয়দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর 'শৈল্পিক সংযম আমাদের দেশের পক্ষে বিস্ময়কর'। মন্দিরা রায় তাঁর এ সংখ্যার প্রবন্ধে বলেছেন, 'জগদীশ গুপ্ত বা ঈষৎ পরবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরাসক্তি ও সংশক্তির এক মিলিত বৃত্ত রচনা করেছেন।'

সময় এগিয়ে চলবে - আর এভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র গল্পের বিষয় - ভাবনা ও নির্মাণকলার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, হতেই থাকবে

---

*সৈয়দ আবদুল মকসুদের লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থ থেকে ইদানীং অবশ্য জানা যাচ্ছে : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটোবেলা থেকেই গল্প - কবিতা লিখতেন এবং হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত ছোটোগল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ বার্ষিকী -তে ১৯৩৯ সালে। এবং তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সাময়িকপত্র মাসিক সাওগাত ১৩৪৮ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল ছোটোগল্প 'চিরন্তন পৃথিবী'।

*ওয়ালীউল্লাহ্-র কিশোর বয়সের প্রথম শিল্প - মাধ্যম ছিল ছবি আঁকা। এ বয়সে তিনি মগ্ন হয়ে ছবি আঁকতেন : রং তুলি কাগজ ছাড়া তাঁর কোনো চাহিদা ছিল না ছোটোবেলায়। পরিণত বয়সে তিনি দ্য স্টেটসম্যান, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্র - পত্রিকায় চিত্রসমালোচনা লিখতেন। শিল্পীদের সান্নিধ্যও তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি নিজে এঁকেছিলেন। বিমূর্ত চিত্রকলার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

**তাঁর বাবা ও মা উভয় দিকের পূর্বপুরুষরা আরব বা মধ্যপ্রাচের কোনো অঞ্চল থেকে মুঘল আমলে বঙ্গদেশে আসেন। তাঁদের পরিবারে ইসলামি মুল্যবোধ ও শিষ্টাচারের সঙ্গে সমন্বয়ী খাঁটি বাঙালিয়ানার কোনো বিরোধ ছিল না। তাঁর বাবা ছিলেন এক ধরনের সুফিবাদী অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবাদী।

তিন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দ্য স্টেট্‌সম্যান-এর চাকরি ছেড়ে রেডিয়ো পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের বার্তা

সম্পাদকের কর্মভার নিয়ে চিরতরে কলকাতা ত্যাগ করেন। প্রথম উপন্যাস লালসালু লেখা শুরু করেছিলেন কলকাতায়, ঢাকায় উপন্যাসটি শেষ করেন ১৯৪৮ সালে। ঢাকায় তখন প্রকাশনা শিল্প গড়ে ওঠেনি। তিনি তাঁর কলকাতায় গড়ে তোলা নিজস্ব প্রকাশন 'কমরেড পাবলিশার্স' থেকে লালসালু প্রকাশ করেন। এখন এই প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত ঠিকানা : ৬২ সুভাষ এভেনিউ, ঢাকা। লালসালু প্রকাশ পায় ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে। উপন্যাসটি পাঠকের একেবারেই মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। ছেপে ছিলেন দু-হাজার কপি, কিন্তু বিক্রি হয়েছিল মাত্র দু-এক শো কপি।

১৯৫১ সালের ৫ মে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নতুন দিল্লিতে পাকিস্তানি হাই কমিশনে প্রেস অ্যাটাশে নিযুক্ত হন। দিল্লি থেকে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বদলি হয়ে যান তিনি। সিডনিতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয় ফরাসি দূতাবাসের তন্বী অফিসার আন-মারি থিবোর সঙ্গে। সিডনি থেকে করাচিতে ওয়ালীউল্লাহ্ বদলি হলে আন-মারিও চাকরি ছেড়ে করাচি চলে আসেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে তাঁদের বিয়ে হয়। জন্মসূত্রে প্রোটেস্টান্ট আন - মারি থিবো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। ইসলামধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাঁদের বিয়ে হলেও তাঁরা উভয়ই ছিলেন জাঁ-পল সাত্র প্রমুখের নিরীশ্বরবাদী অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী। বিয়ের তিন মাস পরে ওয়ালীউল্লাহ্ জাকার্তায় বদলি হন। এই পর্যায়ে এক সময় তিনি লেখালেখি না করে চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬১ সালের এপ্রিলে ওয়ালীউল্লাহ্ বদলি হন প্যারিসে পাকিস্তানি দূতাবাসে। লালসালু ইতিমধ্যে বাংলা ভাষার সুপরিচিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের জন্য ১৯৬১ সালে প্রাপ্ত' বাংলা একাডেমী পুরস্তার' সম্ভবত তাঁকে পুনরায় সাহিত্য - চর্চায় ফিরিয়ে আনে। জীবনের শেষ বছরগুলি তিনি প্যারিসেই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি রচনা করেন বাংলা ভাষার দুই বিস্ময়কর উপন্যাস - চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)।

কালীনাথ দত্তকে জীবনের শেষ দশায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমার লেখা আজও রীতিমত বাঙ্গালা হয় নাই। আজও দেখিতে পাই স্থানে স্থানে যেন ইংরাজীর অনুবাদ করিয়াছি।' সাহিত্য সম্রাট-এর এই অভিমানের অনেক বছর পর সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিতমানস বা অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে এদেশে বাংলা উপন্যাস ইয়োরোপীয় মডেল - মুক্ত হয়ে নিজস্ব ধারায় স্বকীয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩ সালে কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছিলেন, 'পশ্চিম - জগত আজ যতখানি এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরী। ব্যক্তিগত ভাবে আমি হয় তো ততখানি এগিয়ে যাবো বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখাকে পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্য যারা পিছিয়ে আছে।' এই চিঠি ছাড়া ১৯৪৪ সালে সৈয়দ নূরুদ্দিনকে বা ১৯৬৯ সালে সহযাত্রী ও সুহৃদ শওকত ওসমানকে লেখা চিঠিতে উঠে আসা ওয়ালীউল্লাহ্-র সাহিত্য ভাবনার প্রেক্ষিতে তাঁর উপন্যাসের অন্তর্কাঠামো বিষয়ক শান্তনু কায়সারের লেখা দিয়ে এ সংখ্যার উপন্যাস - আলোচনা শুরু হল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাসের ভাষার মূল্যবান ও তীক্ষ্ণধী মূল্যায়ন করেছেন নবীনা প্রাবন্ধিক সংহিতা কুণ্ডু। তাঁর তরুণ বয়সে কাব্যময় স্নিগ্ধ ভাষা - গল্প থেকে বিভিন্ন উপন্যাস রচনার সময় কীভাবে বদলে বদলে গেল, বা তাঁর লেখায় শব্দের ব্যবহার বিষয়ে এই একটি প্রবন্ধ অনেক কথা, অনেক প্রবন্ধের কথা বলে দেয়। এ সংখ্যায় তাই ওয়ালীউল্লাহ্-র সাহিত্যের ভাষা নিয়ে একটি মাত্র প্রবন্ধ মুদ্রিত হল।

প্রায় ৬০ বছর আগে লেখা লালসালু উপন্যাসের সূচনাতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলাদেশের কোনো এক মুসলমান প্রধান অঞ্চলের যে ছবি আঁকেন তা এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলার এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে, যে মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে।' পরের বর্ণনায় মানুষগুলোর সহায়হারা অন্তরের মর্মবেদনায় হাত রাখেন তিনি : 'শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরু গলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালোও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতার হয়ে ওঠে। তাতে দিন - কে- দিন ব্যথা - বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে।' এই বিদ্যা - চর্চার সামাজিক ব্যবহারিক অন্তঃসারশূন্যতার কথা উচ্চারিত হয় এক সময় : 'কেতাবে যে বিদ্যা লেখা তা কোন এক বিগত যুগের চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে - বিদ্যাকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আর নেই।

সুতরাং তাদের বেরিয়ে পড়তে হয়। আর এই বেরিয়ে পড়ার 'ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে।' তারা কেউ নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানায় শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক; কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। মজিদও বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলির মসজিদ- এমনকী গ্রামে - গ্রামে মসজিদগুলো আগে থেকে দখল হয়ে আছে। সে তাই একমাত্র গ্রামীন পির হতে চায় মহব্বতনগরের। সেখানে পরিত্যক্ত কোনো অজানা মানুষের কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার রূপে প্রতিষ্ঠা করে - প্রতিষ্ঠিত করে তার ধর্মীয় - বিশ্বাস নির্ভর শাসন। এই উপন্যাসে সমগ্র মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতার স্থানিক রূপ পায় মজিদ, মহব্বতনগর হয়ে ওঠে সমগ্র মুসলমান সমাজ। এই সমাজের অনুশাসনে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ স্তব্ধ - শিবালি নাচ বন্ধ, মেয়েদের ধান ভানার গান, বিয়ের আসরের নাচ - গানও বন্ধ। এর উলটো ছবি দেখান কথাকার : আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিলো, কিন্তু মজিদের এক'শ দরবার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।' মজিদের এই সাম্রাজ্যে জোতদার খালেক ব্যাপারীর প্রথমা স্ত্রী আমেনা বিবি অবাধ্য হলে তাকে খালেক ব্যাপারী তালাক দিতে বাধ্য হয় - আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে মজিদের শাস্তি বিধানের প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরও নিষ্ঠুরভাবে শাণিত হয়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যে শিক্ষিত যুবক আক্কাস স্কুল গড়তে পারে না, তাহেরের বাপ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, বাপ-ছেলের একই সঙ্গে খৎনা হয় এখানে।

তবু, পৃথিবীর নিয়মে এই ক্ষমতা চিরদিন থাকে না মজিদের। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী, নবাগতা কিশোরী জমিলার ঝরনার মতো হাসির স্বাভাবিক শব্দে এক সময় কেঁপে ওঠে ক্ষমতার অলিন্দ। তার কাছে মজিদের ধর্মীয় অনুশাসন ভাঙে - 'শনের মত চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি'র মাজারে আগমনে ছিঁড়ে যায় মজিদের ভণ্ডামির মুখোশ। বিদ্রোহ করে জমিলা। অকস্মাৎ প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্লাবিত হয় মাজার - খেতে খেতে ব্যাপ্ত হয়ে ঝরে পড়ে থাকে ধানের ধ্বংসস্তূপ। জমিলার বিদ্রোহের সংক্রামণ ঘটে চির বিশ্বাসী শান্ত শীতল মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহীমার মধ্যেও। এর পরও খোদার উপর তোয়াক্কেল রেখে স্থির থাকে মজিদ। সে চেয়ে - চেয়ে ধ্বংসস্তূপ দেখে। তার চোখে কোনো ভাব আসে না। 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ'।

অনুশাসিত মুসলমান সমাজের এমন বিশ্বস্ত ও অমোঘ ছবি আঁকা হয়ে আছে লালসালু উপন্যাসে। এ বিষয়ে তপোধীর ভট্টাচার্য, তুষার পণ্ডিত ও নুরুল আমিন বিশ্বাসের প্রবন্ধগুলি নানা দিক থেকে আলো ফেলে ফেলে নানা ভাবে পাঠককে ভাবাতে থাকে; এ বিষয়ে আর তাই সম্পাদকের ভাবনার ভার বাড়ালাম না।

ছাব্বিশ বয়র বয়সে ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথম উপন্যাস লালসালু লিখেছেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ নয়নচারা প্রকাশ পেয়েছে ততদিনে। গল্প থেকে উপন্যাসে আসার কারণে তাঁর লালসালু-র অনুচ্ছেদগুলোর শেষ অনেকটা তাঁর ছোটোগল্পের শেষের মতো। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস চাঁদের অমাবস্যা-য় তিনি অনেকটা অন্যরকম। অনুচ্ছেদের বিভাগ এখানে সংখ্যাক্রম অনুযায়ী সাজালেও তা ছোটোগল্পের শেষের মতো নয়, বরং

বড়ো লেখার অনুচ্ছেদের মতো একটা স্বাভাবিক ছন্দে দীর্ঘ পথযাত্রার মতো তার থামা ও এগিয়ে চলা। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত লালসালু উপন্যাসে যে সমাজ - সজ্ঞানতার উন্মেষ ঘটে ছিল - ১৯৬৪ সালে এসে কর্মসূত্রে তাঁর বহির্দেশ পরিভ্রমণ, বসবাস ও সনিষ্ঠ অবলোকনের কারণে চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসে তা অনেকটাই বিশ্বজ্ঞানে পূর্ণ ও পরিণত। কথাশিল্পে তিনি যেন ত্রিনয়ন - দ্রষ্টা। তাঁর লেখনী ঘটনার চেয়ে ঘটনা - উত্থিত সত্যের প্রতি আগ্রহী, অনুসন্ধানী।

ওয়ালীউল্লাহ্-র দ্বিতীয় উপন্যাস চাঁদের অমাবস্যা-র বেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপ্স্ পর্বত অঞ্চলে পাইন - ফার - এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বসে লেখা। অথচ সারা উপন্যাস জুড়ে আছে বাংলাদেশের কোনো এক অখ্যাত নদী তীরের বাঁশবাগান, চাঁদ, চন্দ্রলোকের রহস্য, চন্দ্রালোকিত আবছা বাঁশবাগানে পড়ে থাকা একটি যুবতী নারীর অর্ধ - উলঙ্গ মৃতদেহ ও মৃত নারী দেহকে ঘিরে নানা মানুষের মানসলোকের অনুসন্ধান।

উপন্যাসটি গ্রামের স্কুলের যুবক শিক্ষক আরেফ আলি ও গ্রামের যে খানদানি অভিজাত বাড়িতে সে আশ্রিত সেই বড়োবাড়ির ছোটো ছেলে কাদেরকে ঘিরে আলোড়িত। 'জ্যোৎস্না - উদ্ভাসিত' রাতের প্রতি আরেফ আলির অদমনীয় আকর্ষণ। তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে - অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ - পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে কথা শ্রবণাতীত নয় : কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়। বালক বয়সে আরেফ আলি পর পর তিন বছর লায়লাতুল কদরের রাত জেগেছিল এই আশায় যে, 'গাছপালাকে ছেজ্‌দা দিতে দেখবে'। কিন্তু সেদিনের সেই কুয়াশাহীন শীতের উজ্জ্বল রাতে বাঁশ ঝাড়ের আলো - অন্ধকারে দেখতে পেল 'একটি যুবতী নারীর অর্ধ - উলঙ্গ মৃত দেহ'। মৃতদেহ দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেতে দেখল কাদেরকে। এরপর তার জিজ্ঞাস্য, কাদের কি যুবতী নারীটিকে হত্যা করে পালিয়ে গেল? যদি তাই হয়, তবে হঠাৎ এই হত্যার কারণ কি তার আত্মরক্ষা, না অন্য গূঢ় কোনো কারণ আছে এর পেছনে? তার সঙ্গে যুবতী নারীর সম্পর্ক কি কেবলই দৈহিক, না মানসিক সম্পর্ক আছে তাদের? কাদের যে হত্যাকারী এবং হত্যার কারণ যে ধর্মনীতি বিরুদ্ধ অবৈধ মিলন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা - এ কথা আবিষ্কারের পর অনুসন্ধান চলতে থাকে কাদের কে এবং কেন সে খানদানের মূল ভিত্তি 'নেক-চরিত্র'কে কিছুতেই বহন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে যে সত্য উপন্যাসে উঠে এসেছে, সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কাদেরের যে ছবি এঁকেছেন লেখক তা দেখে নেওয়া যাক : 'খাটো মানুষ, কিন্তু বংশজাত চওড়া হাড়। কালো রঙ, চেহারা গঠন ধারালো।' তার পরিপাটি চুলের বাহার চোখে পড়ার মতো, স্বাভাবিক কণ্ঠ রুক্ষ, আর অর্ধ - নিমীলিত চোখ। এই চোখের কারণে সহসা লোকে তাকে অন্তর্মুখি দরবেশ ভাবে। কিন্তু সেই অর্ধ - নিমীলিত চোখে সে যা দেখতে পায় সম্পূর্ণ খোলা চোখে আরেফ আলি তা পায় না। কাদেরের যখন দুনিয়ায় আবির্ভাব হয় তখন বড়োবাড়ির বর্তমান কর্তা দাদাসাহেবের 'ওয়ালেদ বয়োবৃদ্ধ'। 'তখন তাঁর চোখে ছানি পড়েছে, হয়তো চরিত্রে ভীমরতির আভাসও দেখা দিয়েছে।' তার ওয়ালেদের ভীমরতি কি তাহলে কাদের বহন করছে? এই কারণে কি কাদেরের হৃদয় শূন্য? একটা যুবতী জেলে - বউয়ের মৃত্যুতে তার হৃদয়ে দুঃখ - বেদনা জাগে না এই শূন্যতা থেকে! এই কথা যুবক শিক্ষক ভাবে : 'কাদেরের হৃদয়ের শূন্যতার জন্যই যুবতী নারীর মৃত্যুটা একটি নির্মম হত্যা ছাড়া কিছু নয়।' এই ভাবনায় পৌঁছেও স্থির থাকতে পারে না আরেফ আলি। তার জিজ্ঞাসা : 'সৃষ্টিকর্তা কেন কাউকে ভালো করেন কাউকে খারাপ করেন।' কী তার গূঢ় উদ্দেশ্য!

বাইশ - তেইশ বছর বয়সের আরেফ আলির 'খাড়া নাক, চিকন কপাল ইষৎ সমুন্নত, চোখে একটু কাঠিন্য ভাব। তবে রসশূন্য স্বাস্থ্যের জন্যই তার চোখ কঠিন মনে হয়। লক্ষ্য করলে সে চোখের সরলতা, সময়ে সময়ে অসহায়তাও নজরে পড়ে।' লেখকের এই বর্ণনায় মনে হয়, একজন শিল্পীর প্রতিকৃতি আঁকছেন আর এক শিল্পী। নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতভাগ্য যুবতী নারীটি সম্পর্কে এই শিল্পী আরেফ আলি ভাবে, যুবতীটি নিশ্চয়ই একদিন 'স্বপ্নাকাশের অম্লানকুসুমে পরিণত হবে'। কিন্তু বাস্তব অনেক বেশি নির্মম। স্টিমারের অত্যুজ্জ্বল সাদা সন্ধানী - আলো এক সময় যুবতীটিকে আবিষ্কার করে।

'একেবারে বিবস্ত্র। রূপার হারটা ছাড়া গায়ে কিছুই নাই।'

'তওবা তওবা! নীচ জাতীয় মেয়েমানুষ হবে।'

টিফিনের সময় শিক্ষকদের 'গাম্ভীয' - কর্তৃত্বের মুখোশ' খুলে যায়। এ সময় তারা ব্যক্তিগত মতামতের ঢাক-ঢোল বাজায়:

'পুরুষের ও সব দুর্বলতা একটু থাকেই। দোষটি আসলে মেয়েমানুষটির।'

'বিয়ে-থার পর মেয়ে-মানুষের ছেলেপুলে না হলে পুরুষ মরদের জন্য মন খামখাম করে।'

'বলে দিলাম, মেয়েলোকটির সঙ্গে আমাদের মাস্টারটিরও যোগাযোগ ছিল।'

শেষ পর্যন্ত সত্যের পক্ষে দাঁড়াতেই হয় আরেফ আলিকে। তার বিধবা মা ও মুখাপেক্ষী দুই ভাই - বোনদের সম্ভাব্য অসহায় মুখচ্ছবি বা খাসা চাকুরি, বড়োবাড়ির জামাই আদর কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারে না। কিন্তু সহকর্মীদের মতো পুলিশের ভূমিকায় হতবাক হতে হয় আরেফ আলিকে। পুলিশ - কর্মচারী বিকৃত কণ্ঠে তাকে বলে, 'হবে, তদারক হবে। আপনার ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। যার ক্ষতি করতে চান, তার ক্ষতি করা সহজ হবে না।'

পুলিশ - কর্মচারীর এই মন্তব্য খানদানি মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রের আঁতাতের কথা বলে। উচ্চবর্গ ও তাদের এই হৃদয়হীন শাসন শেষ পর্যন্ত করিম মাঝির যুবতী বউয়ের হত্যার সুবিচার হতে দেয় না, আরেফ আলির মতো শিল্পী মনের হৃদয়বান মানুষদের জীবনও বিপন্ন করে দেয়। আর এই শাসনের মূল প্রাণ - ভোমরা লুকিয়ে থাকে 'সিন্ধুকে লুকনো তোস্তারী কিংখাব হতে শুরু করে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা'য়। যে নিষেধাজ্ঞা ধর্মীয় রাষ্ট্রের সহায়তায় ধারণ করে থাকে দদাসাহেবের মতো মানুষদের ধর্মের প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা, সাধুতা দয়াশীলতা, বিনয় - নিরাভিমান ব্যবহার ইত্যাদি গুণাগুণ।

চাঁদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সেই সৌন্দর্যের পার্থিব অনুভূতির স্বাভাবিক বিকাশ তাই থমকে থাকে। সেই সৌন্দর্যকে যারা কামুকতা দিয়ে নষ্ট ও হত্যা করতে চায় - রাষ্ট্র ও সমাজের মূল চালিকা শক্তি থাকে তাদের এবং তাদের মন ও মননের সঙ্গী মানুষদের হাতে। এই সত্য উপন্যাসটিতে সফলভাবে গ্রন্থনা করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্। এ বিষয়ে কথাকার রবিশংকর বলের নিবন্ধটি, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি পাঠককে বিশেষ ভাবাবে।

চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের অভিনব প্রকরণ ও অন্তর্গূঢ় মর্মার্থ বাঙালি পাঠক বা অদীক্ষিত সমালোচক সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৬৮ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের পর্যালোচনায় একজন বলেছিলেন : 'সব মিলিয়ে কাহিনীর যে গতি পরিণতি দেখি, তা এক রহস্যোপন্যাসের স্বাদে ঋদ্ধ।' ওয়ালীউল্লাহ্-র বিশেষ বন্ধু ও সমসাময়িক লেখক শওকত ওসমান অবশ্য পড়ে নিয়ে ছিলেন উপন্যাসের অচিনকথা। আরেফ আলিকে তিনি 'গোটা দেশের জনসমাজের প্রতীক' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশ্বজ্ঞানে আলোকিত নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা এই যুবক শিক্ষকের 'অন্তরপরিব্রজনা' ও স্বৈরতন্ত্রের অধীনে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমানের অন্যায় অবিচারের সম্মুখে বোবা, ভীরু এবং কাপুরুষ ছাড়া আর কী?'

যে - কোনো অপূর্ব সৃষ্টি এমন সমস্যা তৈরি করে। সমসময় থেকে এগিয়ে থাকার কারণে সাধারণ গড়পড়তা পাঠক তার পাঠ গ্রহণ করতে

পারে না। আমাদের কাব্য শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-এর প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই কথা বলেছিলেন : 'বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, অরিজিন্যালিটি সাহিত্যে যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নতুন ক'রে প্রকাশ করে।' ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ওয়ালীউল্লাহ্-র কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একথা অনেক বেশি সত্য হয়ে ওঠে।

যে-কোনো মানুষের শৈশব-কৈশোর এবং প্রথম যৌবন 'জীবনের প্রধানতম হয়ে ওঠার সময়'। ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবনে পৈত্রিক 'সুফিবাদী অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবাদী শিক্ষা' জীবনের যে প্রাথমিক ভিত তৈরি করে দিয়েছিল সেই ভিতের উপর প্রাথমিক ইমারত গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছিলেন কলেজ জীবনের শিক্ষক, 'বুদ্ধির মুক্তি, আন্দোলনের প্রবক্তা কাজী আবদুল ওদুদ। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বার্ষিকী-তে ১৯৩৯ সালে তাঁর একটি গল্প মুদ্রিত হয়। সম্ভবত এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প। এ সংখ্যাটির সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন দুজন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও পরিমল ঘোষ। অন্তর্মুখি স্বভাবের ওয়ালীউল্লাহ্ কোথাও প্রকাশ না করলেও বোঝা যায় তাঁর জীবনে শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদের ভূমিকা। তাঁর প্রথম উপন্যাস ও প্রাথমিক লেখালিখিতে এই মুক্ত বুদ্ধির ছাপ প্রবল স্পষ্ট। ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পাদিত পত্রিকা কনটেমপোরারি* -র প্রথম লেখাটি ছিল কাজী আবদুল ওদুদের : Modern Bengali Literature. ১৯৪৬ - ৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলন যখন শেষ পর্যায়ে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন অনিবার্য তখন অনেকের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্ 'স্বাধীন বাংলা'র দাবিকে সমর্থন করে; লিখিত বিবৃতি দেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, কাজী আবদুল ওদুদ, শওকত ওসমান, গোলাম কদ্দুস প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এই বহিরঙ্গে ইয়োরোপীয় চেহারার মন ও মননে বাঙালি মানুষটি প্রকাশ্যে মার্কসবাদের কথা না বললেও তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায় 'একমাত্র আমাদের মহম্মদ ও কার্ল মার্কস ছাড়া মানবের জন্যে - গোটা মানবের জন্যে আর কেউ সম্ভবপর ও বাস্তবিক বাণী দিতে পারেন নি।'

ওয়ালীউল্লাহ্-র পাঠ্য বিষয় ছিল ভারতবর্ষের আর্থ -সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। প্রাক আর্য - সভ্যতা থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। মুঘল শাসকদের শিল্প - সাহিত্যের আগ্রহ তাঁকে মুগ্ধ করত। বাবরের আত্মজীবনী তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সাহিত্যের এই অমূল্য কীর্তি বাবরনামা-র সত্যনিষ্ঠা তাঁকে মুগ্ধ করত। আঞ্চলিক ভাষা চুখতাই তুর্কিতে লেখা আত্মজীবনীতে জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০) তাঁর পিতা, সহোদর অথবা আত্মীয় পরিজনদের দোষ গোপন করেননি - ধর্মাচরণের সঙ্গে তাঁদের অতিরিক্ত মদ্যপান, এমনকী তাঁদের সমকামিতার আগ্রহও তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ মনে করতেন বাবর শিল্পী, কবি ও আধুনিক গদ্যকার। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে দিল্লিতে থাকার সময় ওয়ালীউল্লাহ্ একাধিকবার প্রাচীন মানুষের শিল্পকর্ম দেখতে আওরঙ্গাবাদ, অজন্তায় গিয়েছেন - ছয় - সাত শতকের বুদ্ধের Fresco দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বার বার।

লালসালু উপন্যাসের জন্য ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তি ওয়ালীউল্লাহ্-কে পুনরায় লেখক জীবনে ফিরিয়ে আনে। এ সময় তিনি চাঁদের অমাবস্যা রচনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি লেখা শেষ করার পর ১৯৬৩ সালের বসন্তে ছ-সপ্তার ছুটি নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ সপরিবারে স্পেন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য দক্ষিণ - পশ্চিম স্পেনের আন্দালুস প্রদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখা। ইতালীয় রেনেসাঁর বহু আগে, ইয়োরোপ যখন অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার অন্ধকারে ডুবে ছিল তখন নয় থেকে একাদশ শতকে এক মহান সভ্যতার আলো জ্বলে উঠেছিল আন্দালুসিয়ায়। যে-আলো অনির্বাণ ছিল কয়েক শতাব্দী ব্যাপী। পৃথিবীর ইতিহাসের এই মহান অধ্যায় নিয়ে ওলায়ীউল্লাহ্ খুব আলোড়িত হতেন।

কয়েকদিন গাড়ি চালিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিস থেকে বার্সিলোনা হয়ে ভ্যালসিয়া মুর্সিয়া গ্রানাডা হয়ে সেভিল পৌঁছোন। তারপর বিস্ময়কর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়ান কর্দোভা গুয়াদালায়ারা তলেদো বরগোস প্রভৃতি প্রাচীন শহর ও নগর। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আলমেরিয়া মুর্সিয়া গ্রানাডা মালাগা কার্দেভা কাদিস সেভিল প্রভৃতি নগরীর প্রাচীন সভ্যতার সমূহ নিদর্শন। সে - কালো আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই শহরগুলো। ধর্মতত্ত্ব - সাহিত্য - দর্শন - তত্ত্বমূলক শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রচলিত ছিল এখানে। পড়ানো হত চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন এবং জ্যোতির্বিদ্যা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ধর্মনিরপেক্ষ - মুসলমান খ্রিস্টান ইহুদি প্রভৃতি সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা ও তত্ত্বলোচনার জন্য আন্দালুসিয়া হয়ে ওঠে পৃথিবীর আদর্শ। আবির্ভাব হয় ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ মুসলমান প্রগতিশীল দার্শনিক বিজ্ঞানীর; অন্যদিকে মাইমোনাইডস -এর মতো জ্ঞানী যিনি ধর্মে ইহুদি, যাঁর সম্পর্কে বলা হয় - তিনি ভাবতেন গ্রিক ভাষায়, লিখতেন আরবিতে আর প্রার্থনা করতেন হিব্রুতে।

স্পেনে যাওয়ার আগে ওয়ালীউল্লাহ্ স্পেনীয় ঐতিহাসিক রাফায়েল আলতামিরার A History of Spanish Civilization গভীর ভাবে পাঠ করেন। সেকালের মুসলমান শাসক ও সমাজপতিদের কোন সে-গুণ প্রাক মধ্যযুগে উপস্থিত ছিল বলে এই সভ্যতা উন্নতির শিখর স্পর্শ করে এবং কী না-থাকার জন্য মুসলমানরা আজ অধঃপতিত -এই ভাবনা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত।

ওয়ালীউল্লাহ্ আন্দলুসিয়ায় প্রথমে গিয়েছিলেন মহান চিত্রশিল্পী লে গ্রেকোর (১৫৪১ - ১৬১৬)-র নগরী তলেদোতে। প্রাক - রোমান যুগে প্রতিষ্ঠিত এই নগরীর স্বর্ণকাল ছিল মূর শাসনকাল ৭১২ থেকে ১০৪৫ পর্যন্ত সময়কাল। এল গ্রেকোর অবিস্মরণীয় কাজ 'ভিউ অব তলেদো' এই নগরে বসে মূর শাসনকালের প্রায় পাঁচশো বছর পরে আঁকা। ওয়ালীউল্লাহ্ তলেদোতে এল গ্রেকোর বাসভবন পরিদর্শন করেন - তত দিনে বাসভবনটি দর্শনীয় স্থান ও যাদুঘর। এরপর তিনি গ্রানাডার জাদুঘর ও পুরাকীর্তি এবং আলহামরা প্রসাদ পরিদর্শন করেন। গ্রানাডার পর এক সপ্তাহর বেশি সময় কাটান মাদ্রিদে। এই রাজধানীর প্রধান আকর্ষণ লা প্রাদো জাতীয় জাদুঘর : পৃথিবীর সমৃদ্ধ শিল্প জাদুঘরগুলোর একটি। উল্লেখ্য, ফ্রাংকোর দীর্ঘ স্বৈরশাসনেও কিন্তু স্পেনের জাদুঘরগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রাদোতে তিনি গয়া, এল গ্রেকো, ভ্যান ডাইক, রুবেসন, ডুয়েরার, ভেলাজকুয়েজ, রিবেরা প্রমুখ শিল্পী ও তাঁদের পরবর্তী ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পী - ভাস্করদের শিল্প - সৃষ্টি দেখেন। গ্রেকোর প্রতি তাঁর ছিল অসমান্য আকর্ষণ। খ্রিস্টধর্মে প্রভাবিত বলে গ্রেকোর Russurrection, Penticost, Crucifixion, Baptism, Burial of the Count Orgez প্রভৃতি অমর সৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষণ করেন। পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আন্দালুসিয়া পরিভ্রমণে যেন তা গভীরতর হল।

স্পেনের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে হিস্পানি চিত্রশিল্প, আধুনিক কথাসাহিত্য - সমস্ত বিষয়ে অশেষ আগ্রহ ছিল ওয়ালীউল্লাহ্-র। বিশেষ করে যে-সমস্ত উপন্যাসের পটভূমি আন্দালুসিয়া সেগুলো ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। আন্দালুসীয় প্রেদ্রো আন্তোনিও দ্য আলারকোন (১৮৩৩ - ১৮৯১), হুয়ান ভালেরা (১৮২৮ - ১৯০৫), হোসে মারিয়া দ্য পেরেদা (১৮৩৩ - ১৯০৬) প্রমুখ উপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিময় বাস্তবধর্মী উপন্যাস পড়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্। দক্ষিণ স্পেনের মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস - মূল্যবোধ ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা যে - উপন্যাসে বিধৃত সে - উপন্যাস তাঁকে আকর্ষণ করত। অবশ্য যে-কোনো ভাষার মূল্যবান সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রিয়। তিনি আন-মারির সঙ্গে পরিচয়ের আগেই পড়ে ফেলে ছিলেন সার্ত্রর ট্রিলজি Roads of Freedom. আধুনিক হিস্পানি সাহিত্যের '১৮৯৮ প্রজন্ম' -এর বিশিষ্ট উপন্যাসিক আন্তর্জাতিক খ্যাত মিগুয়েল উনামুনো (১৯৬৮ - ১৯৩৬) ছিল ওয়ালীউল্লাহ্-র প্রিয় লেখক। উনামুনো ছিলেন দর্শনের ছাত্র এবং কর্মজীবনে ছিলেন গ্রিক সাহিত্যের অধ্যাপক। রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিরোধী এই কথাকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেক্টর' পদ থেকে অপসারিত হন। জেনারেল প্রিমো দ্য রিভেরার একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে নির্বাসিত হন উনামুনো। এ সময় দু-বছর তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন। পরে

অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে ফিরলে জাতীয় পরিষদের 'কোর্টেজ' -এর সদস্য হন। স্পেনের গৃহবন্দি থাকেন এবং গৃহবন্দি অবস্থায় ১৯৩৬ -তে মারা যান। উনামুনোর প্রথম উপন্যাস Paz en la guerra (১৮৯৭) তাঁর শৈশবের স্মৃতিবাহী একটি 'অস্তিত্ববাদী উপন্যাস'। উনামুনোর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম The Tragic Scene of Life in Men and in People (১৯১৩)। তাঁর নায়কেরা সন্দেহ ও বিবেকের তাড়নায় তীব্র মানসিক যন্ত্রণার শিকার। তাঁর উপন্যাস Niebla(১৯১৪)-র চরিত্ররা বাস্তবজগতের সাধারণ মানুষ। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী উনামুনোর শেষ উপনাস San Manuel Beueno, Martir (১৯৩৩) একজন অবিশ্বাসী ধর্মযাজকের জীবনালেখ্য। উনামুনো ছাড়া তিনি হেননি জেমস্ উইলিয়াম ফকনার, ক্লঁদ সিমো, টমাস মান, কাজানজাকিস প্রমুখ লেখকের লেখা পছন্দ করতেন। রুশ ভাষার ধ্রুপদি লেখকরা ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় এবং ঐতিহাসিক টোয়েনবির লেখার তিনি খুব মূল্য দিতেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র বয়স্য সমালোচক - প্রাবন্ধিক শিবনারায়ণ রায় তাঁর কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা গ্রন্থে বলেছেন : 'আঠার শতকের শেষ দিক থেকে উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য পশ্চিমদেশে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। বিজ্ঞান না হয়েও উপন্যাস সর্বগ্রাসী; দর্শন না হয়েও উপন্যাস তত্ত্বকেন্দ্রিক। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কাহিনী ও চরিত্র ছাড়া উপন্যাস হয় না ... মহাকাব্যের যুগে কবিদেরও এ-সুযোগ ছিলো; মহাভারত এবং ডিভাইন কমেডি তার সার্থক প্রমাণ। আধুনিককালে উপন্যাস এই সুযোগ ও দায়িত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছে।...এঁরা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একদিকে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে সর্বমানবীয় সত্তার কল্পনাকে নতুন নতুন দিক থেকে পুনর্বিচার করেছেন।' একথাগুলো সার্বিকভাবে ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাস সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর শেষ দুটি উপন্যাস সম্পর্কে প্রবলভাবে উচ্চারণ করা যায়। ইয়োরোপের উপন্যাসের এই আধুনিক ধারা কিন্তু হঠাৎ ওয়ালীউল্লাহ্ বাহিত হয়ে বাংলায় আসেনি। বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথের হাতে সমুন্নত হয়ে প্রস্তুত হয়েছিল ওয়ালীউল্লাহ্-র মতো লেখকের উন্মেষের। একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শিবনারায়ণ রায় তাঁর ওই একই গ্রন্থে : 'বঙ্কিম তাঁর তিরিশ বছরব্যাপী সাহিত্য - সাধনার মধ্য দিয়ে মননশীলতাকে উপন্যাসিক কল্পনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলেন। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁরই অনুগামী বলা চলে। ...নষ্টনীড় থেকে শুরু ক'রে চার অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবীয় অস্তিত্বের একটি-না-একটি মূল সমস্যার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি করিয়েছেন।'

ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসে 'ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের অন্তঃস্থল' এবং 'সর্বমানবীয় সত্তার কল্পনা'র চরমতম বিকাশ ঘটিয়েছেন। এ উপন্যাস পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে তিনি এই কাজটি দু-ভাবে করেছেন - ছবি এঁকে এবং কখনো কখনো কথাসাহিত্য লিখে। আবার ছবি এঁকেছেন তেল রং চাপিয়ে চাপিয়ে, কখনো আবার কোনো একটি চরিত্রের কথা হয়তো শুরুতে উল্লেখ করেছেন রেখাচিত্রে - তাকে সম্পূর্ণ করেছেন একেবারে শেষে, ততক্ষণে সে - ছবির রেখা মুছে তা হয়ে উঠেছে বিমূর্ত বা ছাঁচভাঙা চিত্রকলা। আর এই সমস্ত কিছুর নেপথ্যে গভীর গোপন ভাবে রয়ে গিয়েছে তাঁর জীবন - জিজ্ঞাসা, জীবনের প্রতি অর্থহীন ভাবাবেগ (useless passion) - এবং এই সমস্ত কিছু ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর প্রান্তিকায়িত মুসলমান জনজীবন সম্পর্কিত আততি ও উদ্‌বেগ।

কাঁদো নদী কাঁদো শুরু হচ্ছে একটি স্টিমার যাত্রায়। 'আমি' এখানে দেখছে আর ভাবছে একটি সাদা - শৌখিন পরিপাটি লোকের কথা, যে লোকটির 'বয়স চল্লিশের মত, বা কিছু বেশি, কারণ কানের ওপরকার চুলে বেশ চাপ দিয়ে পাক ধরেছে।' যার ফর্সা রং অনেকটা জ্বলে - পুড়ে মলিন হলেও চোখ - মুখে এখনও 'কেমন তারুণ্যের নমনীয়তা, সুশীল শান্তভাব।' এই লোকটি জীবন সম্পর্কে তাঁর নানারকম দেখা ও ভাবনাকে ছবি এঁকে এঁকে কথকের মতো বর্ণনা করে। লোকটি যে তবারক ভুইঞা একথা 'আমি' বুঝেও নিশ্চিত হতে পারে না - তার কথা শুনতে শুনতে 'আমি'র মনে হয় লোকটি সম্ভবত তবারক ভুইঞা এবং তা যদি হয়ে থাকে সে 'আমি'র চাচাতো ভাই মুহাম্মদ মুস্তফার কথা একবার অন্তত উচ্চারণ করবে আর এই উচ্চারণে সে ধরতে পারবে সে তবারক ভুইঞা কি না। উপন্যসে মুহাম্মদ মুস্তফা ও অন্যান্যদের কথা লোকটি উচ্চারণ না করে একটি হতভাগ্য শহরের কথা বার বার উচ্চারণ করলে 'আমি'র মনে গভীর সংশয় জাগে। লোকটির বাক্যস্রোত এক সময় 'রীতিমত একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়। তবে এমন একটি ধারা যা মৃদু কণ্ঠে কলতান করে কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে না, দুর্বার বেগে ছুটে যায় না। সে - ধারা ক্রমশ অজানা মাঠ - প্রান্তর গ্রাম - জনপদ চড়াই - উৎরাই দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।' সেই ধারা যেন লোকটি হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায় সে ফিরে যায়'। এইভাবে, ঠিক নদীর প্রবহমান ধারায় জন্ম নিতে থাকে 'আমি'র মানস -উপন্যাস কিংবা 'আমি' ও তবারক ভুইঞার যৌথ মানস - উপন্যাস। আর পূর্ব উল্লেখিত তবারক ভুইঞা বিষয়ক সংশয়ের* মধ্যে থাকে ওয়ালীউল্লাহ্-র বিশেষ কুমুরডাঙ্গাকে সাধারণ কুমুরডাঙ্গা, সারা নদী ভিত্তিক বাংলাদেশের বিশেষ নদী কেন্দ্রিক জনপদকে সাধারণ জনপদে রূপান্তরের উপন্যাসিক কৃৎকৌশল।

লোকটি এক সময় নিজের কথা বলতে থাকে। ছোটোবেলায় লোকেরা তাকে পেঁচা বলত। 'তখন সে সবকিছু ভুলে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষের জীবনযাত্রা তাকিয়ে - তাকিয়ে দেখতো। সে-সময় কত দেউড়ি - খিড়কির পথ দিয়ে সে যে ছায়ার মত আসা - যাওয়া করেছে, এ-বাড়ি সে -বাড়ি গিয়ে কত নরনারীর দৈনিক জীবননাটকে মশগুল হয়ে সময় কাটিয়েছে - তার ইয়ত্তা নেই।' তার মনে সাংসারিক কাজকর্মে আত্মমগ্ন মেয়ে - পুরুষেরা চোখের সামনে যে-চলচ্চিত্র সৃষ্টি কবত সে চলচ্চিত্রে না ছিল কোনো নায়ক বা নায়িকা, না কোনো কাহিনি। কৌতূহলী নেশায় এই জীবন - চলচ্চিত্র অপলক দেখতে দেখতে 'তার পেঁচা-চোখে আর পলক পড়েনি'। এই দেখা তাকে এমন অভিজ্ঞ করেছে 'মুখভঙ্গি দেখেই বলতে পারতো কে ধানের কথা বলছে কে-বা বলছে খাজনার কথা।' লোকটি ভাবে, এইজন্যে তার জীবনে কিছু হয়নি। পরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দিন কেটেছে, নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় হয়ে ওঠেনি। ছাত্রাবস্থায় মেধাবী এই লোকটি যার শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পৌঁছানোর কথা - বাপের মৃত্যুর পর তদবির করে তাকে স্থানীয় স্টিমার ঘাটে টিকেট কেরানি, পরে স্টিমার ঘাট বন্ধ হলে কাছারি আদালতে ছোটোখাটো একটা কলম - পেসার কাজ নিতে হয়। স্টিমার ঘাটের চাকরি নিয়ে বউয়ের সন্ধানে নদী পার হয়ে লোকটি হাস্‌নাতপুর নামক গ্রামে বিয়েও করেছিল। বাহ্যিক রূপ যাই হোক বউটি হয়েছিল তার মনের মতো। এখন 'সে অন্দরমহলের অভ্যন্তর' তার স্ত্রীর দৃষ্টির সাহায্যে এতদিন আবার পরিষ্কার দেখতে পায়।

লোকটার কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে 'আমি'র স্মৃতির 'পর্দায় কোথায় যেন ঈষৎ আলোড়ন' সৃষ্টি করে : কুমুরডাঙ্গার স্টিমার বন্ধ হওয়া ও জীবন - জীবিকার রূপান্তর, মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ মুস্তফার সম্ভাবনাময় জীবনের শেওলা - আবৃত ডোবার - জীবনে আটকে তেঁতুল গাছে ঝুলে আত্মহত্যা প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়; মনে করিয়ে দেয় নারী ও নদীর কান্নার কথা - জন্ম দেয় কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসের।

এই সংখ্যায় কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাস নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হল। বিশিষ্ট তিন প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার ও তপোধীর ভট্টাচার্য উপন্যাসটি নানা মাত্রায় মূল্যায়ন করে দেখিয়েছেন এ-উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্-র পরিণত বোধ ও মননশীলতার কথা। এর বাইরেও অনেক অনেক কথা থেকে যায় -যা থেকে এই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।

'তবারক ভুইঞা বলেছিলো : যে দিন ঘাট থেকে ফ্ল্যাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন রাতেই মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সাকিনা খাতুন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়'

নদীর দিক থেকে আসা এ কান্না কি তবে নদীর? নদী কি কাঁদতে পারে! কুমুরডাঙ্গায় এত নারী থাকতে সাকিনা খাতুনই বা শুনতে পেল না কেন নদীর এই বিচিত্র কান্না? এই প্রশ্নের উত্তর উপন্যাসের অনেক গভীরে, সমাজের গভীর তলাশ্রয়ী এ কান্নার উৎস একেবারে অন্য জায়গায়

*উপন্যাসে তবারক ভুইঞার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'আমি' ভাবে : 'সে কি সত্যি তবারক ভুইঞ ? আমার ভুল হয়নি তো ?' ইত্যাদি

বালিকা বয়সে সাকিনা খাতুনকে নিঃশব্দে ঠোঁট সঞ্চালন করে আবৃত্তি করতে শিখিয়ে ছিল ফোকলা দাঁত আর আকর্ণ দিলখোলা হাসি অশিক্ষিতা নারী জারুনার মা। অর্থহীন এমন অনেক ছড়ার একটি : 'কৃ -এ কলাগাছ আর কচুরিপানা কলমিশাখ খাই, কঞ্চি আনো কলমকাটি ক লিখিয়ে ভাই।' এরকম একটা ছড়া কাটার সময় জারুনার মা যাদুকরের হাত - সাফাইয়ের ভঙ্গিতে ধাঁ করে তার দুটি কানের তুলতুলে নরম প্রান্ত ছেঁদা করে দিয়েছিল। এ সময় জারুনার মা ছড়া কাটে: 'পোড়া কপাল জোড়া লাগে না, কালো জামাই ভালো স্বামী কালো না ফর্সা না ভেবে ক্ষুব্ধ যে অংলকারটি সে পেয়েছিল তারই রঙে তার কল্পনার স্বামী রং সোনারবরণ রূপ ধারণ করে। এরপর 'বকরীদের সময়' দশম কি দ্বাদশ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে জারুনার মা-র মৃত্যু ঘটে। এ কান্না কি তবে জারুনার মার কান্না ? জারুনার মাকে কেউ কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি -'সে সর্বদা হাসতো, কখনো কাঁদতো না।' জীবিতকালে না কেঁদে হেসে গিয়েছিল বলে, হাসির তলে সব ব্যাথাবেদনা লুকিয়ে রেখেছিল বলে কি এখন সে কাঁদছে ? আর সাকিনা খাতুনের জীবনে সোনাবরণ স্বামী আসে না। সে সারাদিন স্কুলে পড়ায়, মায়ের সেবা - শুশ্রূষা করে, ঘরদোর সাফ করে, সন্ধ্যার আগে বাপের জন্যে ভেতরের বারান্দার প্রান্তে বদনা ভরে অজুর পানি রাখে, সকলের অলক্ষে ঘরের কোণে আবছা অন্ধকারে নামাজটা পড়ে নেয়, পরে উঠানের শেষে তিনদিক - খোলা গোয়ালঘরে মধুবিবি নামক গাইটাকে দানা - পানি দেয়, সময় করে ছোট ভাইবোনদের পড়াটা দেখিয়ে দেয়, খাওয়া - দাওয়ার ব্যবস্থা করে, আরও পরে বাসনপাতিল ঘসে মেজে সাফ করে রাখে। এমন কাজ' সে নিত্য নিঃশব্দে একটির পর একটি করে যায়'। আর রাতে ঘুম আসতে দেরি হলে ' 'জীবন - মৃত্যুর কথা, বেহেস্ত - দোজখের কথা, সূর্য - চন্দ্র - নক্ষত্রের রহস্যের কথা, মানুষের কথা' নিশাচর পাখির মতো রাতের অন্ধধকার থেকে উড়ে এসে তার মনে নিঃশব্দে ডানা ঝাপটায়। নিয়ম করে সে প্রতিদিন বেলা সাড়ে নটার দিকে নদীর ধারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তখন তার 'মাথায় কালো ছাতা, পিঠের কাছাকাছি বেণীর শেষাংশে জীর্ণ কালো ফিতার প্রজাপতি - বন্ধন...'। তার সোনারবরণ স্বামীর স্বপ্ন এখন মৃত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে 'জীর্ণ কালো ফিতার প্রজাপতি বন্ধন' -এ। নদীর এ কান্না কি তাহলে জারুনার মা-র মতো সাকিনা খাতুনের মতো সংসারে ব্যবহৃত নারীদের কান্না ! এ কান্না কি তবে এক মৃতের যা শুনতে পাচ্ছে অন্তরে গভীরতর ক্ষত নিয়ে আর এক জীবন্মৃত !

এই কান্নার কথা উপন্যাসের শেষে 'আমি'র হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে : '...সহসা আমার মনে হয় নদী যে নিস্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যই। মনে মনে বলি : কাঁদো নদী কাঁদো।' এ কান্নার মধ্যে তাই মুহাম্মদ মুস্তফার, খোদেজার নিস্ফল জীবনের কান্নাও মিশে থাকে।

নক্ষত্রের মতো ছিটকে চলে যাওয়া আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মহাম্মদ মুস্তাফাদের ধারণ করতে প্রান্তিক মুসলমান জনসমাজ আজও অপারগ, অপ্রস্তুত। তাকে এগিকে প্রতি মুহূর্তে পেছনে টানে 'শ্যাওলা - আবৃত ডোবার মত ক্ষুদ্র পুকুর' হয়ে প্রান্তিক মুসলমান জনসমাজ ও তার খোদেজার মতো নারীরা; আর একদিকে তাকে সামনে আকর্ষণ করে আশারাফ হোসেন চৌধুরীর কন্যা - রূপে - গুণে - শিক্ষায় লেহাজ - আত্মহত্যা থেকে সাময়িক বিরত করে কিন্তু তাকে মরতেই হয়। বাল্য বয়সে তেঁতুলগাছ তলার অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়েও শেষ পর্যন্ত তাকে সেই তেঁতুলগাছে ঝুলতে হয়। আর সেই নিষ্প্রাণ দেহের পলকহারা খোলা চোখ তাকিয়ে কী যেন সন্ধান করতে থাকে শ্যাওলা - আবৃত ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে।

উচ্চশিক্ষিত মুহাম্মদ মুস্তাফাকেও তো পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না খোদেজা। তার সঙ্গে আর এক অপরিচয়ের দূরত্ব - যেখান থেকে সে মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো ভাই, 'আমি'কে জীবনে গ্রহণ করতে সম্মত হয় এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সম্পর্কে 'আমি'কে জনান্তিকে বলে, 'মুস্তাফা ভাইকে বড় ভয় করে'। এই বাগদত্তাকেও তাই শেষ পর্যন্ত শ্যাওলা - আবৃত ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে ডুবে মরতে হয়।

কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাস এত বছর পেরিয়েও এই সময়ের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে, এই কারণে। এই উপন্যাসে বার বার উচ্চারিত আকায়িদ - ঈমানের প্রাচীরে ঘেরা দুর্গের অনুশাসনে আচ্ছন্ন 'শ্যাওলা - আবৃত ডোবার মত ক্ষুদ্র পুকুর' হয়ে থাকা প্রান্তিক মুসলমান জনসমাজ ও তার সমস্যা পাঠককে ভাবায়, ভাবাতে থাকে।

ওয়ালীউল্লাহ্-র ইংরেজি ভাষায় লেখা দি আগলি এশিয়ান উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি সাজ্জাত শরিফকে দিয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্-র মামাতো বোন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা সুলতান সারওয়াতারা জামান। সাজ্জাত শরিফ তখন ভোরের কাগজ ও প্রথম আলো-র সাহিত্য সাময়িকী ও অন্যান্য ক্রোড়পত্র সম্পাদনার দায়িত্বে। তাঁর উদ্যোগে শিবব্রত বর্মনের তরজমায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ পায় প্রথম আলো -র ইদ সংখ্যা ২০০২ -এ। আর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ফেব্রুয়ারি ২০০৬ -এ অবসর প্রকাশন সংস্থান, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০ থেকে। একটি কল্পিত দেশের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসের অনুবাদে নাম হয়ে যায় কদর্য এশীয়া। দেশটি কল্পিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল যে - কোনো দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে এই কল্পিত দেশের হুবহু মিল। এই উপন্যাসের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে উপন্যাসের শেষে 'একজন এশীয়র সংলাপ' অংশে আহসানের বয়ানে কথাকার লিখেছেন :

> মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহায়তা যা দেয়, তার একটি অংশের লক্ষ্য থাকে আধুনিকীয়নে সহায়তা করে, তাতে শুধু মার্কিন সামরিক ঘাঁটিরই সুবিধা হয় না, ক্ষমতাসীনরাও যে কোনো অনভিপ্রেত জঙ্গি - বিরোধিতা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে জনগণকে একথা বোঝানোর জন্য প্রচার প্রচারণ শুরু হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাশিয়া কিংবা চীন ঢুকে পড়বে। প্রথম যুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার লাভ করে, দ্বিতীয় যুক্তিটি কাজে লগে প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণকারীদের মুখ বন্ধ করতে ।

ষাটের দশকের একেবারে প্রথমে রচিত কদর্য এশীয়-র প্রেক্ষিতে ওয়ালীউল্লাহ্ -র এমন অনেক উপলব্ধির সত্যতার মূল্যায়ন করেছেন তিন মননশীল প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী, বসন্ত লস্কর ও সুমন ভট্টাচার্য। কদর্য এশীয় উপন্যাসের প্রাথমিক নির্মাণে দি আগলি আমেরিকান উপন্যাসের প্রভাবের কথাও তিনি আলোচক প্রসঙ্গ উল্লেখ করে - উপন্যাসটির পাঠ ও আলোচনার সময় অনুবাদের প্রসঙ্গ টেনে মূল ইংরেজি না পড়তে পারার অতৃপ্তির কথা বলেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -র অনুবাদ উপন্যাস কদর্য এশিয়া-র পশ্চিমবাংলায় সম্ভবত এটা প্রথম মূল্যায়ন প্রচেষ্টা আশাকরি, তাঁর এই উপন্যাসটি বুঝতে এই প্রবন্ধত্রয় পাঠককে বিশেষ সহযোগিতা করবে।

বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকটা অভিনীত হয়েছে নিশ্চয়ই জানো। অভিনয়ের প্রথম দিন আমাকে ও জয়নুলকে ওরা নিমন্ত্রণ করেছিলো। আগাগোড়া ভালো লেগেছে। অভিনয়ের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য এবং কল্যাণী কুমারমঙ্গলমের অভিনয় অদ্ভুত সুন্দর লেগেছে। তাছাড়া গোপাল হালদার অভিনয়ের সময় (ওঁর রোলটার সময়টুকু ছাড়া) আমার ও জয়নুল আবেদীনের মাঝখানে বসেছিলেন। গোলাম কুদ্দুস ওঁকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে এই সর্বপ্রথম পরিচয়। ...পেছনে বসেছিলেন হীরেন মুখো ও আবু সয়ীদ আইয়ুব। শেষোক্ত মহোদয় থেকে থেকে ঝুঁকে এসে আমাদের কানের কাছে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। আমাকে এক সময়ে বললেন : আপনার লেখা পড়বার সুযোগ ও সৌভাগ্য আজো হয়নি। হাসলাম এবং মনে মনে বললাম, হবার কথা নয়।

বাংলাদেশের নব নাট্য আন্দোলনের প্রথম প্রযোজনা নবান্ন নাটকের অভিনয়ের প্রথম দিন উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সহপাঠী বন্ধু, সাংবাদিক সৈয়দ নূরুদ্দিনকে এভাবে চিঠিতে প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিজন ভট্টাচার্যের এই নাটকটি ১৯৪৩ -এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা। উল্লেখ, জয়নুল আবেদীনের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়ায় আঁকা রেখাচিত্র তাঁকে সারা বৃথিবীতে পরিচয় করিয়ে দেয়। আর দুর্ভিক্ষের একবছর পরে ওয়ালীউল্লাহ্-র নয়নচারা গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ পায় - যে গ্রন্থের নাম-গল্প থেকে বেশ কয়েকটি গল্পের বিষয় দুর্ভিক্ষ।

নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলাদেশের নব নাট্য আন্দোলন বিষয়ে কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন সৈয়দ নূরুদ্দিকে লেখা তাঁর এই চিঠিটি তার সাক্ষ্য বহন করে। এ সংখ্যায় ওয়ালীউল্লাহ্-র লেখা নাটকের সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছেন নব নাট্য আন্দোলনের উত্তরকালের আর একজন নাট্যকার ও নির্দেশক দেবাশিস মজুমদার।

১৯৩৬ সালে ফেনী হাই স্কুলের ছাত্ররা যে হাতেলেখা হাউস ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছিল কিশোর ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন সেই পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকার নাম ভোরের আলো ও তাঁরই দেওয়া, কিশোর বয়স থেকে তাঁর এই পত্র - পত্রিকা প্রকাশের আগ্রহ তাঁকে পরবর্তী জীবনে খবর কাগজের জীবিকা, সাময়িক পত্রিকা কনটেমপোরারি প্রকাশ এবং 'কমরেড পাবলিশার্স'-এর দিকে নিয়ে যায়।

তাঁর কনটেমপোরিরি-র অন্যতম লেখক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বরাবরই তাঁর ইচ্ছা ছিল ওয়ালীউল্লাহ্-রর মতো 'আত্মবৃত্তি ও জীবিকা' নিয়ে মহানগর কলকাতায় বসবাসের। এই বিষয়ে তরুণ ওয়ালীউল্লাহ্কে লেখা পরিণত বয়সি জীবনানন্দের কয়েকটি চিঠি মুদ্রিত হল এ সংখ্যায়। চিঠিগুলির পেনসিলে - লেখা খসড়া থেকে কপি করার দুরূহ কাজটি করে দিয়েছেন জীবনানন্দ - গবেষক কবি ভূমেন্দ্র গুহ। এ সংখ্যায় ছাপা কপি করা চিঠির সঙ্গে ১৯৪৬ সালে বাহাদুর - মার্কা লাইনটানা এক্সারসাইজ খাতার পাতাগুলো ফিল্ম করে হুবহু ছেপে দেওয়া হল। উল্লেখ্য, জীবনানন্দের খাতাটি তাঁর ভাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশের সৌজন্যে পাওয়া।

১৯৬০ - এর দশকে পাকিস্তানের আইয়ুব এবং ইয়াহিয়া সরকারের মোটেই সুনজরে ছিলেন না ওয়ালীউল্লাহ্। একজন বাঙালির ইউনেস্কোতে চাকরি পাওয়াকে পাকিস্তান সরকার কোনোদিন ভালোভাবে নিতে পারেনি। তাদের চাপে ইউনেস্কো তাঁকে ব্যাংকক বদলি করলে ওয়ালীউল্লাহ্ ইউনেস্কার বিরুদ্ধে জেনেভার আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেন এবং পরাজিত হয়ে ইউনেস্কোর চাকরি হারান। পাকিস্তান দূতাবাসের চাকরি তাঁর আগেই বস্তুত চলে গিয়েছিল। এ সময় বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে - ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত ও অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেন ওয়ালীউল্লাহ্। এই অপরাধে ইউনেস্কো তাঁর অবসরভাতাও বন্ধ করে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বদেশের বিপর্যয় ও বিভুঁইয়ে বেকারত্বের উদ্বেগ অজ্ঞাতসারে তাঁর রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৭১ -এর ১০ অক্টোবর রাত দশটা নাগাদ পঠনরত অবস্থাতেই মস্তিস্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় এই মহান ব্যক্তিত্বের।

লেখালিখির পরিমার্জনায় বিশ্বাস করতেন ওয়ালীউল্লা্। তাঁর লেখা প্রায় পঞ্চাশটি গল্পের মাত্র কয়েকটি পরিমার্জিত হয়ে দুটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর বাইরে থেকে যাওয়া ছোটোগল্পগুলো তাঁর ছোঁয়ায় গ্রন্থবদ্ধ হলে বাংলা ছোটোগল্প সমৃদ্ধতর হত। আর নতুন উপন্যাস না লিখলেও তাঁর শেষ দুটি উপন্যাসের কোনো একটি অনূদিত হয়ে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেলে - প্রকৃত মূল্যায়ন হত এই বিশ্বমানের বাঙালি লেখকের।

আফিফ ফুয়াদ